সাধনা জীবনের উপলব্ধি- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ব্যাক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ ' প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সার।(ষষ্ঠ সেমেষ্টারের ছাত্রীদের জন্য)

চৈতালী ঘোষ-দর্শন বিভাগ,রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ

'ব্যাক্তির সঙ্গে বিশ্বের সম্বন্ধ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তি মানুষ ও বিশ্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে , প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে , ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি তূলনামূলক আলোচনা করেছেন। কবি-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় ত্ত প্রাচীন গ্রীক ত্ত ইউরোপীয় সভ্যতার পার্থক্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিকাশের আঁতুড়ঘর ছিল কংক্রীটের তৈরী। প্রকৃতিকে পরাভূত করার নেশায় উন্মত্ত পাশ্চাত্যের মানুষজন প্রকৃতিকে সবসময় প্রতিপক্ষ বলে ভেবে নিয়েছে। ইঁট, কাঠ, সিমেন্টের প্রাচীর মানুষ মানুষে, মানুষ-প্রকৃতিতে তৈরী করেছে দুস্তর ব্যাবধান। নগর সভ্যতায় মানুষের সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ তার নিজস্ব কর্মকান্ডের দিকে-সে যে বিশ্ব-প্রকৃতির অংশ বই আর কিছু নয় -এই বোধ তার লুপ্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য ধারণায় প্রকৃতি অচেতন বস্তু, জীব-জন্তুর আবাসস্থল, আর তা সবসময় নীচুস্তরের। নৈতিক ও বৌদ্ধিক চেতনায় সমৃদ্ধ মানব প্রকৃতি সবসময় ই শ্রেষ্ঠ। জগতের সঙ্গে মানুষের কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকায় সে এক বন্দীজীবন যাপন করে। এই বিচ্ছিন্নতার দরুন, পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে প্রকৃতি থেকে নেওয়া সমস্ত কিছুই জোর করে আদায় করা বলে মনে হয়, আর তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় প্রতিটি পদক্ষেপের ভারসাম্য রক্ষার জন্য।

প্রত্যেক জাতিই তার নিজস্ব আদর্শ অনুযায়ী তার সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো তৈরী করে। চেষ্টা করে এই ছাঁচে তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা পরিচালিত করতে, তার অধিবাসীদের গড়ে তুলতে। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষকে সর্ববিষয়ে পরাক্রমশালী করতে চেষ্টা করেছে, প্রকৃতির উপর তাকে প্রভুত্ব বিস্তার করতে শিখিয়েছে, অন্য জাতি গোষ্ঠীর উপর নিজের কতৃত্ব কায়েম করার বিদ্যা শিখিয়েছে, আর এই কারণে সে চেষ্টা করেছে তার সমর সম্ভার বিপুল ভাবে বৃদ্ধি করতে। পরিণতিতে সে সমগ্র জগৎ সংসার থেকে ,বিশ্ব প্রকৃতি থেকে নিজেকে পরিপুর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করেছে। সে ভুলতে বসেছে তার জীবনদায়ী সমস্ত উপকরণের যোগান আসে বিশ্ব প্রকৃতি থেকে, মৌচাক নিজের থেকে তার মধু সৃষ্টি করতে পারেনা এই চরম সত্য সে অবসৃত হয়েছে। নিজেকে নিজেরই তৈরী দুর্গের মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিনিয়ত সে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করছে ,আর হারিয়ে ফেলছে তার নিজস্ব গুণাবলী। প্রয়োজনের সীমারেখা অতিক্রম করে সে অমিতাচারী হয়েছে। তার কামনা বাসনা গুলো তার যাপনের সহায়ক না হয়ে নিজেরাই লক্ষ্য হয়ে ঊঠেছে। ফলত অসীমের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ নিজেকে তার বিশালত্বের আয়নায় প্রতিবিম্বিত করে স্পর্ধা অনুভব করেছে। গতির নেশায় উন্মত্ত হয়ে হারিয়ে ফেলেছে পরিপূর্ণতার অনাবিল আনন্দ। আকাশ, বাতাস, বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক গতিময়তায় যে প্রশান্তি তা থেকে নিজেকে সে বঞ্চিত করেছে ,করে চলেছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত।

অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতার মূল প্রসবন শহরে নয় বনে। আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে তখন এখানে ছিল বিশাল বনভূমি। এই বনভূমি শুধু তাদের আশ্রয় ই দেয়নি, জীবনধারনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীরও যোগান দিয়েছিল। জীবনযাত্রার বিভিন্ন দরকারী জিনিসের সহজলভ্যতার নিরিখে বনাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের বসতি স্থাপন করেছিল। এইভাবে ভারতবর্ষে যে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটি সহজ সরল আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই যাপন পাশ্চাত্যের কাছে আদিম ,নীচুস্তরের মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল গতি, ছন্দে পরিপুর্ণ এক প্রবাহমানতা। নিজের অধিকৃত সম্পদের চারিদিকে প্রাচার প্রকৃতির থেকে অন্য মানুষের থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। অধিকারের আকাঙ্খা নয়, উপলব্ধির প্রয়াস, নিজস্ব মনন ও চেতনার স্তর কে উন্নত করে মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার সংযোগ ছিল তার মূল লক্ষ্য।সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেসঙ্গে এই অরণ্যভূমি গুলি কৃষি জমিতে রুপান্তরিত হয়েছে, নগর পত্তন হয়েছে, পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে কিন্তু ভারতীয় চেতনা ,ভারতবাসীর মনন সবসময় তার অনাড়ম্বর অতীত জীবনচারেরণ প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেছে।

পাশ্চাত্যের মত প্রকৃতিকে পরাভূত করার প্রয়াসে সে কখনোই ব্রতী হয়নি, কারণ তার চেতনায় তার দীক্ষায় প্রকৃতি প্রতিযোগী নয় বরঞ্চ সহযোগী। ব্যাক্তি ও বিশ্বের সমন্বয়ে ভারতবাসী সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিল, তার চেতনায় মানুষের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও ছিল এক মহান সত্যের অংশ। পাশ্চাত্যের মত প্রকৃতি কখনোই তার কাছে অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক ছিলনা বরং তা ছিল লক্ষ্যে পৌঁছানোর সোপান। এই চলার পথে প্রকৃতি তাকে যা দিয়েছে তাই সে অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছে, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বিত এই বোধে প্রাণিত ভারতবাসী তার প্রতিটি কর্মে , প্রতিটি অনুভবে এই সুমহান ঐক্য উপলব্ধি করেছে। এই উপলব্ধি তাকে চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত করে দেহ আত্মা ও চারপাশের সমস্ত উপকরণের মধ্যে পূর্ণ আত্মীয়তায় যে ঐক্যতান সৃষ্টি হয় তার অপার আনন্দ আস্বাদন করতে শিখিয়েছে। তাই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যুক্ত স্থানগুলিই ভারতবাসী তীর্থক্ষেত্র বলে বিবেচনা করেছে যেখানে সংকীর্ণ গন্ডির থেকে বেরিয়ে অসীমের মধ্যে সে নিজের স্থান উপলব্ধি করতে পারে।এই বোধই তাকে মূল্যানুযায়ী বিভিন্ন বস্তুর তূলনা থেকে বিরত রেখেছে, অধিকারের শক্তি নয় বরং ঐক্যের শক্তিকেই সে সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

প্রাচীন সভ্যতার সুমহান আদর্শ সম্বন্ধে ভারতবাসীর মনে এক সুউচ্চ ধারণা ছিল। ক্ষমতা অর্জন নয়, সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অধিকতর বিত্তশালী হওয়া নয়, দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা নয়, বরং অসীমের উপলব্ধি অর্জন করা ছিল তার কাছে বেশী দরকারী। এর জন্য তাকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই প্রাপ্তি তার কাছে ছিল পরম প্রাপ্তি। রাজা, মহারাজা, রাজনীতিবিদেরা থাকলেও সে বরণ করে নিয়েছিল ঋষিদের যাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করে চির প্রশান্তি লাভ করেছিলেন, সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছিলেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ করে বিশ্বজীবনে আবিষ্ট হয়েছিলেন।এইভাবে সবকিছুর সঙ্গে আমাদের যোগ উপলব্ধি করা, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের মাধ্যমে সবকিছুতে প্রবিষ্ট হওয়া ভারতে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য ও সার্থকতা বলে গণ্য করা হতো।জগতে সবকিছুই ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত বলে ভারতবাসী মনে করে। যে দেবতা অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে ,বনস্পতিতে অর্থাৎ বিশ্ব ভুবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন, সেই দেবতাকে আমরা বারবার প্রণাম করি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবাসীর এই ধারণা তাই কিছুতেই জগত বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। বরং পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই তাঁকে দর্শন করা যায় , সবকিছুর মধ্যেই তাঁকে স্মরণ করা যায়। উপনিষদে ও আমরা এই দীক্ষা ই পাই। উপনিষদে বলা হয়েছে যে তেজোময়,অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম।শুধুমাত্র আকাশে নয়, আমাদের আত্মাতে ও তিনি বিরাজমান।বিশ্ব চেতনা লাভ করতে হলে আমাদের অনুভুতিকে এই সর্বব্যাপী অনন্ত অনুভুতির সঙ্গে মেলাতে হবে। আত্মত্যাগের মাধ্যমেই এই অনুভুতি লাভ সম্ভব। গীতায় যে নিরাসক্ত কর্মের কথা বলা হয়েছে তা এই অনুভুতির স্তরে পৌছাঁনোর অন্যতম সোপান। শুধুমাত্র প্রকৃতিতে নয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুর মধ্যে আমাদের সর্বানুভ কে উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধি করতে অপারগ হলে আমরা ধ্বংসাভিমুখী হয়ে যাব।এ পৃথিবীতে যা কিছু সবই অমৃত, প্রাণের থেকে নিঃসৃত, আর প্রাণেই তরঙ্গায়িত-কারণ প্রাণ বিশাল। আমাদের কর্মে, ধর্মে, প্রেমে, সমস্ত জীবের সঙ্গে একাত্ম হওয়া ও এইভাবে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের মধ্যে আত্মস্বরুপ উপলব্ধি করাই হল মঙ্গলের প্রধান তাৎপর্য।

<u>তথ্যসূত্র</u>

1.Tagore,Rabindranath(2013): Sadhana-The Realization of Life. Createspace Independent Publisher.

2. Tagore, Rabindranath : Rabindra Rachanavali(1986), vol2, vol7, vol14.

3.সাধনা-জীবনের উপলব্ধি:রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনুবাদ নীলা দাস(২০১৯), সিগনেট প্রেস।

চৈতালী ঘোষ-দর্শন বিভাগ,রাণীগঞ্জ গার্লস কলেজ